দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃহত্তর বঙ্গ ও বাঙ্গালা সাহিত্য[১]

ভারতবর্ষ মহাদেশের লক্ষণযুক্ত একটি বিরাট দেশ। এই দেশে প্রায় চল্লিশকোটি লোকের বাস। এই বিশাল দেশের এবং বিশেষ করিয়া ইহার উত্তর-পূর্ব্বভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক জটিল প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। ইহাদের মধ্যে জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও ভৌগোলিক কতিপয় প্রশ্নই অবশ্য প্রধান।

ভারতের অধিবাসিগণ এক জাতীয় নহে নানাজাতীয়। ইহাদিগের মধ্যে ককেশীয় জাতির তিন শাখা যথা—"বৈদিক আর্য্যগণ" উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও আংশিকভাবে দাক্ষিণাত্যে, "দ্রাবিড়"গণ সর্ব্ব-দক্ষিণ ভারতে এবং "প্রাচ্য"গণ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় নামক অপর জাতিত্রয়ের বিভিন্ন শাখা স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশে বসতিস্থাপন করিয়াছে। এই জাতিসমূহের মধ্যে নেগ্রিটো জাতির অতি অল্প নিদর্শন এই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ককেশীয় জাতির শাখাগুলির মধ্যে "বৈদিক আর্য্যগণ" "উত্তরদেশীয়" (Nordic), "দ্রাবিড়গণ" "সামুদ্রিক" (Proto-Mediterranean) এবং "প্রাচ্যগণ" "পাহাড়ী" (Alpine) শাখার অন্তর্গত হওয়া বিচিত্র নহে।

ভৌগোলিক বিশেষত্বের দিক দিয়া ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—হিমালয় প্রদেশ (উত্তরাখণ্ড), উত্তরভারতের সমতলভূমি (আর্য্যাবর্ত্ত), দাক্ষিণাত্য (উত্তর-দক্ষিণাপথ) ও সর্ব্বদক্ষিণ-ভারত (দক্ষিণ-দক্ষিণাপথ) বা দ্রাবিড় দেশ। সংস্কৃতির দিক দিয়া উত্তর ভারতের সমতলভূমি আবার তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা পঞ্চসিন্ধুদেশ বা উত্তরাপথ (পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্ত) মধ্যদেশ বা মধ্য আর্য্যাবর্ত্ত এবং প্রাচ্য (পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্ত)। মতান্তরে পঞ্চসিন্ধুদেশকে মধ্য আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত করা চলিতে পারে। এই হিসাবে এই অংশটিকেও পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্ত বলা যায়।

---

(১) সংক্ষিপ্ত এই লেখাটি পূর্ব্বে "শ্রীহট্ট সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা"তে, কার্ত্তিক ও মাঘ সংখ্যায় (১৩৫০ বাং) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই রচনাটি আমার "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" নামক গ্রন্থেও অংশতঃ গৃহীত হইয়াছে।

বাঙ্গালীগণের স্বদেশ বাঙ্গালাদেশ "প্রাচ্য" (গ্রীক Prasii) ভূখণ্ডের অন্তর্গত। বাঙ্গালীজাতি প্রাচ্যের প্রধান উল্লেখযোগ্য জাতি। ভারতের আর্য্যজাতিসমূহের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিগত আদর্শ বেদ হইলেও প্রাচ্যের বাঙ্গালী আর্য্য প্রভৃতি জাতির আদর্শ অনেক পরিমাণে তন্ত্রশাস্ত্র হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষিবৃন্দ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও বাঙ্গালার কতিপয় সুসন্তান আমাদের দৃষ্টি এইদিকে নিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট আছেন।

প্রাচ্য বা পূর্ব্বভারত বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, ভক্তিশাস্ত্র, নব্য-ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি প্রচার করিয়া ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দিকে ভারতের চিন্তাধারার এক নূতন রূপ দান করিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারেও পূর্ব্ব-ভারতের দান অল্প নহে। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দিকে প্রাচীন মগধরাজ্য ও ইহার রাজধানী পাটলিপুত্র যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। মহাভারতের যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্য্যন্ত দিল্লী মহানগরী (প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ) যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল, একসময়ে রাজগৃহের রাজশক্তির উত্তরাধিকারী পাটলিপুত্র মহানগরী তদ্রূপ সমস্ত উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীন মিথিলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত দানও অল্প নহে। প্রাচীন নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিহারদ্বয়ও বৌদ্ধযুগে এই দুইটি বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগে এই প্রাচ্যেরই অন্তর্গত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্মরাজ্যের গৌরবময় উল্লেখ রহিয়াছে। বিহারের অন্তর্গত মগধ, বৈশালী, চম্পা ও মিথিলারাজ্য ভিন্ন, উত্তরবঙ্গে গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যদ্বয়, মধ্য-বঙ্গে কর্ণসুবর্ণ রাজ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে বঙ্গরাজ্য, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ও ত্রিপুরারাজ্য, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কামরূপরাজ্য, আসামের সুরমা উপত্যকায় কাছাড়রাজ্য এবং প্রাচ্যের পূর্ব্বসীমান্তে মণিপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিভিন্ন সময়ে রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব্ব-ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল।[১] প্রাচ্যের নিকটবর্ত্তী নেপাল ও আরাকান রাজ্যদ্বয়ের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

---

(১) পাল, শূর, সেন, নাথ, খড়্গ, চন্দ্র, দেব, বর্ম্মণ, মাণিক্য ও নারায়ণ প্রভৃতি রাজবংশ মূল বাঙ্গালাদেশে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া এই দেশকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে।

এই প্রাচ্যভূমির সীমানির্দ্দেশ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে শোণ নদ, মহাকাল পর্ব্বত ও বেনগঙ্গা, দক্ষিণে গোদাবরী নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব্বে পাতকোই, মণিপুর ও লুসাই পর্ব্বতশ্রেণী অথবা একেবারে ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদী। এই বিস্তৃত ভূভাগ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও নানাজাতির বাসভূমি।

প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত বাঙ্গালা প্রদেশ আয়তনে ও লোকসংখ্যায় প্রাচ্যের অপরাপর অংশ হইতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাভাষীর দেশ হিসাবে প্রকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজ-শাসিত বাঙ্গালা প্রদেশ অপেক্ষা বৃহত্তর সন্দেহ নাই। উড়িষ্যা, আসাম ও বিহার প্রদেশের অনেকখানি অঞ্চলের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। এই বিষয়ে আসাম প্রদেশের অধিবাসীদিগের ঘনিষ্ঠতা বাঙ্গালা প্রদেশের অধিবাসীদিগের সহিত খুবই বেশী বলা যাইতে পারে; এমতাবস্থায় বাঙ্গালা ও আসামকে একত্র করিয়া ইহার সহিত ছোটনাগপুর বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশ সংযোগ করিলে বাঙ্গালা ভাষাভাষী অধিবাসীদিগের যে প্রদেশটি কল্পনা করা যায় তাহাই প্রকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ। এই প্রদেশটির সহিত ইংরেজ-শাসিত পূর্ব্বতন প্রদেশের ও বর্ত্তমানে সামরিক শাসিত বিভাগের সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই অঞ্চল খনিজ ও কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ এবং একটি বৃহৎ অংশ নদীমাতৃক। এই বর্দ্ধিতায়তন প্রদেশের প্রধান ভাষা বাঙ্গালা হইলেও আর্য্যেতর অনেক ভাষাও এই অঞ্চলে কথিত হয়। এই ভাষাসমূহের অধিকাংশই আদিম জাতিগুলির ভাষা। ছোটনাগপুর ও আসাম প্রদেশের আদিমজাতিদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুরমা উপত্যকার অধিবাসীদিগের কথা বৃহত্তর বাঙ্গালা সংগঠন উপলক্ষে বিবেচনা করিতে হয়। সুরমা উপত্যকার অধিকাংশ অধিবাসী, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসিগণ তো বরাবরই বাঙ্গালী আছেন। একমাত্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কথা বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় এই অঞ্চলের অধিবাসিগণের ভাষা বাঙ্গালা বা তাহার প্রকারভেদ হইলেও এবং বাঙ্গালীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও একশ্রেণীর অধিবাসী স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহা দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্যের বিরোধী। এই বৃহত্তর বঙ্গ বা "মহাবঙ্গের" অধিবাসিগণ বিভিন্ন অংশের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া এক মহাজাতি-গঠনে সহায়তা করিলেই এই দেশের মঙ্গল।

আমরা এইস্থানে বাঙ্গালীজাতি ও বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে কতিপয় সমস্যার উল্লেখ করিতেছি।

(১) বাঙ্গালীজাতি গোড়াতে কি ককেশীয় জাতির তিনশাখার কোন একটি শাখা হইতেও আসিয়াছে ? তাহা ঠিক হইলে ইহারা অর্থাৎ "প্রাচ্য" নামধেয় বাঙ্গালীগণ কি অনেকাংশে Alpine শাখাভুক্ত পামিরীয় না দ্রাবিড় এবং ইহারাই কি "ব্রাত্য" ? খুব সম্ভব ইহারা Alpine শাখারই অন্তর্গত পামিরীয় (Pamirians)। মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত সভ্যতার আংশিক অধিকারী কি ইহারাই না অপর কোন জাতি ? প্রাচীন তুরানীয় জাতির শাখা বলিয়া পরিচিত দ্রাবিড়গণ কি Proto-Mediterranean ককেশীয় জাতি ? তিব্বত-ব্রহ্মী নামক মঙ্গোলীয়গণের যে যে শাখা বাঙ্গালা ও আসামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে তাহাদের "আর্ট" ও সংস্কৃতির এখন কি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরই বা কাহারা ? অষ্ট্রিক (Austric) জাতির মুণ্ডারি ও অন্যান্য শাখার বংশধরগণের বাঙ্গালায় সংস্কৃতিগত কি দান অবশিষ্ট রহিয়াছে ? বর্ত্তমানে বাঙ্গালার কোন্ কোন্ জাতিকে অষ্ট্রিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে ? এই সব বিভিন্ন জাতি কিরূপে, কোথা হইতে এবং কোন্ কোন্ সময়ে পূর্ব্ব ভারতে প্রথম আগমন করিয়াছিল ? সর্ব্বশেষে বৈদিক ও পৌরাণিক আর্য্যগণের উত্তরাধিকারিগণ বাঙ্গালাদেশকে যে সংস্কৃতিগত দান দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহার পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়াছে কি ? অদ্যাপি ইহারা বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের প্রধান ও বিশিষ্ট অংশ হইলেও এই দেশে তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছে কি ? এই প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশে সময়ের দিক দিয়া নেগ্রিটোগণ ছাড়া প্রথমে Austric জাতি, তৎপরে বিভিন্ন সময়ে Alpine জাতি, Tibeto-Burman জাতি ও দ্রাবিড় জাতির (Proto-Mediterranean) বিভিন্ন শাখা এবং সর্ব্বশেষে বৈদিক আর্য্যজাতি (Nordic) আগমন করিয়াছিল কি ? এই বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে রক্তের সংমিশ্রণ অনুমিত হয় তাহারই বা স্বরূপ কি ? বাঙ্গালীজাতির প্রধান ভাগ কি অষ্ট্রো-আলপাইন না মঙ্গলো-দ্রাবিড় ? বৈদিক আর্য্যসভ্যতা বাঙ্গালীর অধিবাসিগণকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া ইহাদিগকে যেরূপে সমাজ ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে নূতন রূপ ও প্রেরণা দান করিয়াছিল তাহার কতটা ধারাবাহিক ইতিহাস এ যাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে ?

(২) বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতি বলিতে সম্ভবতঃ বাঙ্গালার উল্লিখিত প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে Austro-Alpine রক্তের সংমিশ্রণ সম্পন্ন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত আদানপ্রদানের ফলে উদ্ভূত, বঙ্গভাষাভাষী অথচ বিভিন্নধর্ম্মী

অধিবাসিগণকে প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে। বাঙ্গালার এই সংমিশ্রিত অষ্ট্রো-আল্লাইন জাতি অথবা আংশিক অবিমিশ্র প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির জীবনযাত্রার ধারা এবং তাহাদের শিল্পকলা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। প্রাচীন বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে এইদিকে আমাদের বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এবং এই উপলক্ষে গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণপ্রণালী, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যা প্রভৃতি কলাবিদ্যা, যন্ত্রশিল্প, কুটিরশিল্প, নৌশিল্প, বস্ত্রশিল্প ও সীবনশিল্প প্রভৃতি শিল্প, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, বিভিন্ন জাতিবিভাগ ও উপজীবিকা, চিকিৎসা, অস্ত্রবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা, সংস্কৃতি, স্ত্রী-পুরুষের বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা ও অধিকার, ধর্ম্মমত, ধর্ম্মপ্রচার, দার্শনিক মতবাদ, সমুদ্রযাত্রা, শৌর্য্যবীর্য্য, রাজনৈতিক চেতনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বাঙ্গালী-জাতির একটী সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

(৩) বাঙ্গালীজাতি অতি প্রাচীনকালে বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে বহির্ভারতের অনেক সুদূর দেশে গমনাগমন করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তার করিয়াছিল। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দো-চীন, মালয় ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাহার অস্পষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির উপনিবেশস্থাপনের বহু লুপ্তপ্রায় চিহ্ন এইসব দেশে, বিশেষতঃ ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আনাম (চম্পা) ও মালয় প্রভৃতি দেশে এবং সুমাত্রা, যাভা, বলি ও লম্বক প্রভৃতি দ্বীপে অনুসন্ধান করিলে অদ্যাপি পাওয়া যাইতে পারে। French Indo-China এবং Dutch East-Indiesএর গভর্ণমেণ্টদ্বয়ের অধুনালুপ্তপ্রায় মিউজিয়মগুলিতে ইহার অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। এই মিউজিয়মগুলিতে এবং উল্লিখিত দেশসমূহের অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ করিয়া সঠিক তথ্য বাহির করা একান্ত কর্ত্তব্য। একমাত্র দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় জাতি ও পূর্ব্ব-ভারতের প্রাচ্য জাতি (প্রাচীন বাঙ্গালী-জাতি) এই উভয় জাতির দানই এই অঞ্চলগুলিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এই উপলক্ষে দ্রাবিড় জাতি ও প্রাচ্য জাতির দানের তুলনামূলক সমালোচনা করাও চলিতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের যে সব নিদর্শন এইসব দেশে রহিয়াছে তাহারও একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে ভাল হয়। এইসব অঞ্চলে পালি ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব কি পরিমাণ ছিল তাহাও দেখা উচিত। বাঙ্গালাদেশে ও তাহার প্রতিবেশী

পূর্ব্বদিকের এইসব দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবের তুলনামূলক পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৪) বাঙ্গালীজাতির বিস্মৃতপ্রায় শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার অনেক নিদর্শন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যাইতে পারে। এইদিক দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা অপরিহার্য্য মনে হয়। অবশ্য ইহার একটা সাহিত্যিক মূল্যও আছে। আমরা এখন তাহা লইয়া বিচার করিতেছি না। উল্লিখিত বিষয়গুলি উপলক্ষে এই সাহিত্যের কতিপয় বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করাই আপাততঃ যথেষ্ট মনে করিতেছি।

(ক) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য খৃষ্টীয় ৮ম কি ৯ম শতাব্দীতে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। মাগধী অপভ্রংশ হইতে আগত ও ত্রিপুরার "রাজমালা" বর্ণিত "সুভাষা", আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষা অবশ্য ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই গঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তুলট কাগজে রক্ষিত ও হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুথি-পত্রের যে পরিচয় এখন পাওয়া যায় তাহা ইহার কয়েক শতাব্দী পরে লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যেসব মূল্যবান্ তথ্য এইসব পুথিতে লিপিবদ্ধ আছে, নিম্নে তাহার মধ্যে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মের চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া নানা লৌকিক ধর্ম্মের ছাপও ইহাতে বর্ত্তমান আছে। এই লৌকিক ধর্ম্মগুলি কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। লৌকিক ধর্ম্মগুলির কোনটি অষ্ট্রিক জাতি, কোনটি পামিরীয়ান জাতি, কোনটি তিব্বত-ব্রহ্মী জাতি আবার কোনটি বা আর্য্যজাতি হইতে আসিয়াছে। অবশ্য ঠিক কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ জাতি হইতে ইহারা প্রথমে আসিয়াছে সে সম্বন্ধে অনুমান করা ছাড়া আর পথ নাই। কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অষ্ট্রিকজাতীয় অধিবাসিগণের কোন কোন শাখা সুদূর অতীতকালে সভ্য ও উন্নত থাকাও অসম্ভব নহে। প্রাচীন "নাগ" জাতি কি ইহাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী না ইহারা দ্রাবিড়? খুব সম্ভব ইহারা অষ্ট্রিক শাখারই অন্তর্গত। তাহারা তো সভ্য ছিল বলিয়াই মনে হয়। ভারতের নানা অংশে সর্প-পূজার সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

চণ্ডীদেবী, মনসাদেবী ও ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজা রাজশক্তির সাহায্যে কতটা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল তাহা বলা কঠিন, তবে বৌদ্ধ

ও হিন্দুধর্ম্ম যে অন্ততঃ সাময়িকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে রাজশক্তির সাহায্যলাভ করিয়াছিল তাহার পরিচয়ের অভাব নাই।

(খ) বৈদিক আর্য্যগণ এইদেশে বসতিস্থাপনের অনেক পরে উত্তর-বঙ্গে (বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগে) পালরাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। পালরাজবংশের অভ্যুদয়ের কিছু পরে প্রথমে শূরবংশ ও তৎপরে সেনরাজবংশ বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মও সেনরাজবংশের প্রচেষ্টায় যথোচিত প্রসারলাভ করিয়াছিল। মুসলমান অধিকারের সময়ও সুদীর্ঘকাল বৈদিক ও পৌরাণিক মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের নেতৃত্বে হিন্দুসমাজে ইহার আদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এইস্থানে বলা আবশ্যক—তখন তান্ত্রিক আদর্শও ক্রমশঃ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়া উভয় ধর্ম্মমতকেই নূতন রূপ দান করিয়াছিল। বৈদিক ও তাহার উত্তরাধিকারী পৌরাণিক মতের সহিত তান্ত্রিক মতের অপূর্ব্ব সমন্বয় এই বাঙ্গালাদেশেই সম্ভব হইতে পারিয়াছিল। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এতদ্দেশীয় তান্ত্রিক মতের প্রবেশলাভও বৌদ্ধধর্ম্মজগতে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। কামরূপ, গৌড় ও নবদ্বীপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পৌরাণিক ধর্ম্মমত ও আদর্শের প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তান্ত্রিক ধর্ম্মের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপ এখন আর জানিবার উপায় নাই। তবে ইহার আদর্শ ও পূজাপদ্ধতি যে বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে, হিন্দু (পৌরাণিক) শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মকে এবং মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রচুর রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। লৌকিক ধর্ম্মগুলির মধ্যে—হিন্দুমতের শৈব ও শাক্তধর্ম্ম তান্ত্রিক ও পৌরাণিক প্রভাবে পড়িয়া বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, এবং এই দুইটি লৌকিক ধর্ম্মের প্রাথমিক পুষ্টির স্থান নির্ব্বাচন করিতে গেলে গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর-রাঢ় দেশকেই সেই সম্মান দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সঙ্গত। সংগুপ্ত বুদ্ধ (?) অথবা বৌদ্ধগন্ধী লৌকিক ধর্ম্মঠাকুরের পূজা একমাত্র রাঢ়দেশে ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। ইহারও কারণানুসন্ধান প্রয়োজন। আর একটি কথার উল্লেখ এইস্থানে করিতেছি। লৌকিক স্ত্রীদেবতাগুলি মূলতঃ আর্য্যেতর বা অনার্য্য অষ্ট্রিক ও তিব্বত-ব্রহ্মী জাতিগুলি হইতে আসিয়াছে কি না তাহা বিশেষ করিয়া দেখা দরকার। ইহা ছাড়া বাঙ্গালায় ককেশীয়জাতিগুলির মধ্যে প্রাচ্য পামিরীয় জাতি হইতে শিবদেবতা, সমুদ্রপ্রিয় দ্রাবিড়জাতি হইতে বিষ্ণুদেবতা এবং বৈদিক আর্য্য-

জাতি হইতে সূর্য্যদেবতা প্রথম আসিয়াছেন কি না তাহাও বিবেচনাসাপেক্ষ।

বাঙ্গালা ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে মানবজাতির ভারতবর্ষীয় শাখাগুলির অন্তর্গত সমস্ত জাতিই বসবাস করিয়া বাঙ্গালার ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিতরে যে এক অপূর্ব্ব সমন্বয় আনিয়া দিয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ করিলে তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বৈষ্ণবসাহিত্য এবং কুলজীগ্রন্থনিচয়ে তাহার অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই সাহিত্যগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্যসমূহে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস অনেক পরিমাণে নিবদ্ধ আছে। গৌড়রাজ্যকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস ও লৌকিক কাব্যের মধ্যে আদি মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথমে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গল সাহিত্য ও ধর্ম্মঠাকুরের পূজা গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত রাঢ়ের বাহিরে পাওয়া কঠিন। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী এবং মনসামঙ্গলের দেবী মনসা হয়তো বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্বদিক হইতে যথাক্রমে প্রথমে এদেশে আসিয়া থাকিবেন। চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল সাহিত্য পাঠ করিলে উত্তর-বঙ্গ, হিমালয় প্রদেশ ও কামরূপ অঞ্চলের সহিতই যেন এই দুই দেবীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। গৌড়রাজ্যকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে এই দুই মঙ্গলকাব্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিলেও পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব-বঙ্গে ও দক্ষিণ-বঙ্গে শাক্ত সাহিত্যের অংশ হিসাবে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ শাক্তসাহিত্যের দিকে এবং পশ্চিম-বঙ্গ বৈষ্ণবসাহিত্যের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বলা যায় কি? রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্য প্রথমে পশ্চিম-বঙ্গ ও কালক্রমে দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গে সমভাবে প্রসারলাভ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালার রাজ্যগুলির এবং বিশেষ করিয়া গৌড়রাজ্যের উল্লেখ অপরিহার্য্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারের সহিত এই রাজ্যগুলির বিশেষ সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং এই রাজ্যগুলির নাম ও ইহাদের ভৌগোলিক সংস্থান জানা একান্ত আবশ্যক। এই রাজ্যসমূহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজশক্তির অভ্যুদয় ও উৎসাহের ফলে বাঙ্গালার সংস্কৃতির ও বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। গৌড়রাজ্যের অধীশ্বর পাল ও সেনরাজবংশ এবং পরবর্ত্তী মুসলমান নরপতিগণ রাজনীতি ও বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে প্রচুর যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গৌড় মহানগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কীর্ত্তিকলাপ লুক্কায়িত আছে। মোটামুটি এই জেলা ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের কিয়দংশ লইয়া প্রাচীন গৌড়রাজ্য প্রথমে গঠিত হইয়াছিল। কালক্রমে "গৌড়দেশ" কথাটির নানা অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। কোন সময়ে বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের দক্ষিণাংশকে গৌড়রাজ্য বলিত। আবার কোন সময়ে পশ্চিম-বঙ্গ অর্থে "গৌড়" শব্দ ব্যবহৃত হইত।

ইহার কারণ বোধ হয় যে রাঢ়দেশ ইহার অন্তর্গত ছিল এবং "বঙ্গদেশ" (পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ) ইহার শাসনের বাহিরে ছিল, অন্ততঃ স্বতন্ত্রদেশ বলিয়া গণ্য হইত। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে (১৬শ শতক) আছে, "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ।" এক সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশকেই "গৌড় দেশ" বলিত। "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রমুখ বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান "বাঙ্গালী" অর্থে বৈষ্ণবসাহিত্যে "গৌড়িয়া" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। খৃঃ৮ম শতাব্দীতে (খৃঃ ৭৩৯ অব্দে) পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল "গৌড়ে" (টলেমির "গঙ্গারিজিয়া") প্রথম স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার মূল রাজধানী ছিল বর্ত্তমান মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত ওদন্তিপুরে। যে কোন বাঙ্গালার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, উত্তর-বঙ্গের প্রায় পশ্চিমসীমায় বিহার প্রদেশের সন্নিকটে ও ওদন্তিপুরের অনতিদূরে গোপাল তাঁহার গৌড় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। যে স্থানে গৌড় অবস্থিত উহা উত্তর-বঙ্গের "বরিন্দ" নামক উচ্চভূমির অন্তর্গত। গঙ্গার উত্তর তীরস্থ এইস্থান সুরক্ষিত বিবেচনায় এবং বাঙ্গালার অধিক অভ্যন্তরে প্রবেশের বাধা হেতু হয়তো এইস্থানে গৌড় মহানগরী প্রথমে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। আমাদের ইহা অনুমান মাত্র। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে উত্তর-ভারতে "পঞ্চগৌড়" বলিয়া একটি কথার প্রচলন ছিল। পরবর্ত্তী বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশগুলি সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকল। বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান অনেক নৃপতি "পঞ্চগৌড়েশ্বর" উপাধি ধারণ করিতেন। এইরূপ "পঞ্চদ্রাবিড়" বলিয়াও একটি কথা আছে।

এই গৌড়রাজ্য হইতে একটি প্রাচীনতর রাজ্য গৌড়ের পূর্ব্বদিকে সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজ্যটির নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বৈদিকযুগের "আরণ্যক" সাহিত্যে ও পরবর্ত্তী কালে মহাভারতে এবং পুরাণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতীয় যুগে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বিখ্যাত রাজা ছিলেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মহানগরী কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গত "মহাস্থানগড়" নামক স্থানকে অনেকে এই নগরীর শেষচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় করতোয়া নদী এবং উত্তরে তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদ। তিস্তা নদ বারংবার গতিপরিবর্ত্তনের জন্য কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উত্তরে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা কুচবিহার রাজ্য। এই দুই রাজ্যের পূর্ব্বে কামরূপ রাজ্য অবস্থিত ছিল।

(ঘ) তিস্তার ন্যায় ব্রহ্মপুত্র নদের অন্তত: একবার গতিপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। আসাম হইতে বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিয়া এই নদের পুরাতন খাত ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার নূতন জলপ্রবাহ "যমুনা" নদী নামে ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগের সীমানির্দ্দেশ করিতেছে। কোন সময়ে এই পুরাতন খাতের দক্ষিণ তীর পূর্ব্ব-বঙ্গের উত্তর সীমা বলিয়া এবং ইহার উত্তর তীর হিমালয় পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত প্রসারিত কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ সীমা বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপে করতোয়া নদ কোন সময়ে উত্তর-বঙ্গের পূর্ব্বসীমা এবং কামরূপ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিত। তিস্তানদের জলধারা এক সময়ে করতোয়া (প্রাচীন নাম "সদানীরা") নদে পতিত হইত। প্রাচীন পূর্ব্ব-বঙ্গের দক্ষিণ সীমা পদ্মানদী। পদ্মানদীর দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও তৎসহ সমতট, নিম্ন-বঙ্গ বা দক্ষিণ-বঙ্গ অবস্থিত ছিল।

গঙ্গার প্রাচীন এক ধারা পূর্ব্বদিকের পথে করতোয়া নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ধারা আরও পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান ঢাকা মহানগরীর নিম্নস্থ নদী প্রাচীন "বুড়িগঙ্গা" নামে ও নিকটস্থ ধলেশ্বরী নদী নামে ক্রমশ: পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে শীতলক্ষা ও মেঘনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধারা "ভাগীরথী" বা "হুগলী" নদী নামে পূর্ব্বে বাগড়ি ও পশ্চিমে রাঢ়দেশের সীমানির্দ্দেশ করিয়া কলিকাতা মহানগরীর নিম্ন দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। সেনরাজগণ তাঁহাদের রাজ্যকে চারিটি ভাগ করিয়া প্রদেশগুলির নাম "রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগ্ড়ি ও বঙ্গ" এই নাম দিয়াছিলেন। প্রথমে নিম্ন বা দক্ষিণ-বঙ্গ ও পরে পূর্ব্ব-বঙ্গ লইয়া বঙ্গদেশ গঠিত হইয়াছিল। ইহাই সুপ্রাচীন "বঙ্গ"দেশ এবং বর্ত্তমান সমস্ত প্রদেশের বাঙ্গালা বা বঙ্গ নামটি এই "বঙ্গ"দেশ হইতে আসিয়াছে।

গঙ্গার উত্তর তীরে বরেন্দ্র ভূমি (বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গ বা রাজসাহী বিভাগ)।

এই অঞ্চলে সেনরাজগণের (১০ম—১২শ শতাব্দী) অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে রাজ্যসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় সুবিখ্যাত। এই রাজ্যদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যদ্বয় হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত কামরূপ (কাঁওর) এবং কোচবিহার। ইহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। বরেন্দ্র ও এইসঙ্গে সমগ্র উত্তর-বঙ্গের উত্তরদিকে প্রাকৃতিক সীমা হিমালয় পর্ব্বত, ইহার পশ্চিম দিকের প্রাকৃতিক সীমা মহানন্দা নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও মহানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলাকেও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে কুশী নদীই বৃহত্তর বরেন্দ্রের পশ্চিমসীমা।

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের উত্তরাংশে অবস্থিত "কানসোণা" গ্রামকে কেহ কেহ প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রাচীন "সুহ্ম" ও "কর্ণসুবর্ণ" প্রদেশদ্বয় লইয়া এরূপ মতভেদ আছে যে ইহাতে অবাক হইতে হয়। কেহ কেহ "সুহ্ম"কে রাঢ়দেশ বলিয়া এবং কেহ কেহ চট্টগ্রাম বিভাগে ধার্য্য করেন। "কর্ণসুবর্ণ" কেহ কেহ মুর্শিদাবাদ জেলায়, কেহ কেহ বর্দ্ধমান জেলায় এবং কেহ কেহ ত্রিপুরা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক আমরা উভয় দেশকে আপাততঃ পশ্চিমবঙ্গে বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বর্ত্তমানে অবস্থিত নবদ্বীপ মহানগরী কোন সময়ে সেনরাজগণের রাজধানীর গৌরব লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপের স্থাননির্দ্দেশ লইয়াও গোলযোগ আছে। কেহ কেহ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে, কেহ কেহ পশ্চিম তীরে এবং কেহ কেহ ভাগীরথীর ঠিক মধ্যভাগে এই মহানগরীর প্রাচীন স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য বিষয়টি বহু বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছে।

বাগ্‌ড়ি অঞ্চল সুন্দরবনের অরণ্য সমাবৃত থাকিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের সতত পরিবর্ত্তনশীল নদ-নদীসমূহের গতিপথে অবস্থানহেতু বসবাসের পক্ষে বিশেষ অনুকূলস্থান বলিয়া বিবেচিত হইত বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ এইজন্য এই অঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত ইছামতী ও মাতলা নদী দুইটির পূর্ব্ব-তীর বঙ্গ বা পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক এবং পশ্চিম তীর রাঢ়দেশের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক ক্রমে উপনিবিষ্ট হইয়া অনেকটা সামাজিকভাবে এই উভয় অংশের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এই উভয় নদীর দুই তীরই শাসনতান্ত্রিক হিসাবে পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত ছিল। নিম্ন-বঙ্গের যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা লইয়া প্রাচীন "বঙ্গ"-বা "সমতট" দেশ প্রথমে গঠিত হইয়া থাকিবে। মতভেদে চট্টগ্রামের উপকূলভাগ হইলেও

আমাদের মতে এই সমতট ভূভাগের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় পদ্মানদী এবং তাহার উত্তর-পূর্ব্ব তীর হইতে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের পুরাতন খাত পর্য্যন্ত মূল পূর্ব্ব-বঙ্গ। এই পূর্ব্ব-বঙ্গ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া আরও উত্তর দিকে গারো পাহাড় পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে মেঘনা নদী অতিক্রম করিয়া শ্রীহট্ট (অধুনা আংশিক আসাম প্রদেশের মধ্যে) ও কুমিল্লা জেলা এবং ত্রিপুরারাজ্য এমন কি ক্রমশঃ প্রাচীন উপবঙ্গের অন্তর্গত নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমূহকেও কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে।

বাঙ্গালা প্রদেশের লোকজনের বসবাস, রীতি-প্রকৃতি ও নানারাজ্য সংস্থাপনের ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় আর্য্যাবর্ত্তোদ্ভব বিভিন্ন জনস্রোত গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া কেবলই যেন পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে যাইতেছে। ইহার ফলে পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্ব্বদিকে কতকগুলি স্থান যথা—পূর্ব্বস্থলী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কোটালিপাড়া, ফুল্লশ্রী ও বিক্রমপুর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। আবার যদি পূর্ব্বদিকের কথা বিবেচনা করি, তবে দেখিতে পাইব কতিপয় জনস্রোত পূর্ব্বদিক হইতে বাঙ্গালার পশ্চিম-দিকে ছুটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় জাতির অনেক বংশধর আছে। উত্তর-বঙ্গের উত্তর ও পূর্ব্বদিকের বিভিন্ন মঙ্গোলীয় জাতি এই অঞ্চলের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে এবং অপরপক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উত্তর-বঙ্গে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে। বাঙ্গালা প্রদেশের বাহিরের মঙ্গোলীয়গণ হিমালয় প্রদেশে, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (বিশেষতঃ সানদেশে), মণিপুর রাজ্যে ও আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতিস্থাপন করিয়াছে। এই শেষোক্ত স্থানের অধিবাসিগণ "আহোম" নামে পরিচিত। দক্ষিণ হইতে আরাকানের মগগণ নিম্ন ও পূর্ব্ববঙ্গে এবং আসামে প্রথমে লুটপাট করিয়া পরে এই অঞ্চলে অনেকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশের পথ বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগরে উপকূল দিয়া দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন সময়ে রাঢ়দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং ক্রমে "বাঙ্গালী"নামে পরিচিত হইয়াছে। এই পথে বাঙ্গালীগণও দক্ষিণদিকে গিয়াছে।

"প্রাচোর" অন্তর্গত বৃহত্তর বাঙ্গলা ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে এই স্থানে সামান্য যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করা গেল তাহা প্রদেশটির বৈশিষ্ট্য এবং ইহার অধিবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে মূলগত ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখাইবার পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও বিষয়টির গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। এদেশবাসিগণ ইহা উপলব্ধি করিলেই আশার কথা।